মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৪র্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০২৩

দ্বিতীয় পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহের সূচনা ও স্মারক প্রদান

গত ২০ মে ২০২৩ শনিবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহের সূচনা ও অনুদান প্রদানকারী ব্যক্তিদের স্মারক প্রদান অনুষ্ঠান। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চারজন প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, আসাদুজ্জামান নূর এমপি, মফিদুল হক ও সারা যাকেরের উপস্থিতিতে এই স্থায়ী তহবিল সংগ্রহের অভিযান সূচিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তব্যে ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, আমরা আটজন ট্রাস্টি যে যাত্রা শুরু করেছিলাম তাদের মধ্যে যে কয়জন অবশিষ্ট রয়েছে তাদের মধ্যে চারজন এখানে উপস্থিত রয়েছি। আমরা এবং আমাদের নিবেদিত প্রাণ কর্মীরা একটা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি। এই চ্যালেঞ্জে আমরা আপনাদের সাথী হিসেবে পেতে চাই। সেই আশা নিয়ে আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ ৫২ বছর পরেও কেন এতো প্রয়োজন? ২০ মে ১৯৭১, আজ থেকে ৫২ বছর আগে আজকের দিনে পাকবাহিনী যখন খুলনা শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলের দিকে ধাবিত হয় তখন ডুমুরিয়া থানার চুকনগরে প্রাণ ভয়ে ভীত কিছু মানুষ এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগদানে আগ্রহী সাধারণ মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। তারা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল। সেই চুকনগরে ঘটেছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গণহত্যার ঘটনা। এই গণহত্যার পিছনে পাকবাহিনীর মটিভিশন কি ছিল? তারা মনে করেছিল এখানে যারা আশ্রয় নিয়েছে তারা মুসলমান নয় এবং এরা ভারত দ্বারা প্রভাবিত জনসাধারণ। এই যে জাতিগত বিদ্বেষ থেকে নৃশংস গণহত্যা তারপর আজকে বায়ান্ন বছর পর যদি একটি মানবিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চান তা হলে মুক্তিযুদ্ধের তৃতীয় প্রজন্মের সন্তানদের একটা দায় আছে। এই দায় পূরণের আকাঙ্ক্ষা থেকেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। এ কারণেই

অনুদানের চেক প্রদান করছেন গীতাঙ্ক দেবদীপ দত্ত ও তার সহধর্মীনি শ্রাবন্তী দত্ত

আমরা মনে করি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। এই জাদুঘর জনগণের জাদুঘর। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যেমন জনমানুষের যুদ্ধ ছিল এই জাদুঘরও তেমন জনমানুষের সহায়তায় তৈরি হয়েছে। এই নতুন ভবন নির্মাণে ১০২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যার ৫৫ ভাগ সরকারি অনুদান এবং বাকি ৪৫ ভাগ সাধারণ মানুষের। ব্যাংক, কর্পোরেট সেক্টর থেকে শুরু করে স্কুলের বাচ্চাদের টিফিনের টাকায় এই জাদুঘর নির্মিত হয়েছে। আমরা চাইছি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে স্বনির্ভর করতে। আমরা এই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছি, আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন। এরপর বক্তব্য প্রদান করেন ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের। সারা যাকের তার বক্তব্যের শুরুতে একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করেন। যেখানে দেশবাসীর উদ্দেশে তহবিল সংগ্রহের আহ্বান উপস্থাপন করা হয়। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, ১৯৯৬ সালে যাত্রা শুরু করা চার হাজার বর্গফুটের ভাড়া বাড়ির মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এখন প্রায় একশগুণ বড় আন্তর্জাতিক মানের সুরম্য অট্টালিকা ভবন। প্রতীকী ইট বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে আমরা তহবিল সংগ্রহ করা শুরু করেছিলাম।

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সিএসজিজের বিশেষ আলোচনা

আন্তর্জাতিক আইন, বিচার ও গবেষণা

আলোচক : অধ্যাপক এম রফিকুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক আইন, বিচার ও গবেষণা বিষয়ক আলোচনায় অধ্যাপক এম রফিকুল ইসলাম (মাঝে)

৭ জুন ২০২৩, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অস্থায়ী গ্যালারিতে সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর আয়োজনে অধ্যাপক এম রফিকুল ইসলামের সাথে আন্তর্জাতিক আইন, বিচার ও গবেষণা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা সঞ্চালন করেন সিএসজিজের সমন্বয়ক ইমরান আজাদ। আলোচনার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সিএসজিজের পরিচাল মফিদুল হক। তিনি অধ্যাপক রফিকুল ইসলামকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, সেন্টারের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে রফিকুল ইসলাম জাদুঘরের সাথে আছেন। আন্তর্জাতিক আইন ও বিচার বিষয়ে অধ্যাপক ইসলামের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আলোচনার জন্য নির্ধারিত বিষয়ের উপর রফিকুল ইসলামের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সেন্টারের সাথে যুক্ত তরুণ শিক্ষার্থী, স্বেচ্ছাসেবী ও গবেষকরা ভবিষ্যতে লাভবান হবে। বক্তব্যের শেষে মফিদুল হক বলেন, আজকের আলোচনা শুধু বক্তার বক্তব্যের মধ্যেই না, উপস্থিত সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আরো স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠবে।

স্বাগত বক্তব্য শেষে অধ্যাপক এম রফিকুল ইসলামের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন ইমরান আজাদ। অধ্যাপক এম রফিকুল ইসলাম বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাকুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের এমিরেটাস অধ্যাপক। দীর্ঘ ৩০ বছর আইন অনুষদের অধ্যাপক ও গবেষক এবং একই সাথে আইন অনুষদের উচ্চতর গবেষণা ডিগ্রি (পিএইচডি ও এমফিল)-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে সম্প্রতি ২০২২ সালের শেষের দিকে তিনি অবসরে যান। ১৯৭৫ সালের মার্চ থেকে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সাধারণ আইন এখতিয়ারের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তার দীর্ঘ ৪৫ বছরের আইনি শিক্ষা ও গবেষণার অভিজ্ঞতা রয়েছে। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ ও ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ১৯ মে, ২০ মে এবং ১০ জুন ২০২৩ 'ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ' বিষয়ে নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের নিয়ে সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এই নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনগুলোতে বক্তব্য প্রদান করেন জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্যসচিব সারা যাকের, ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, মফিদুল হক এবং আসাদুজ্জামান নূর। সম্মিলনে মূল বিষয়ের উপর আলোচনা ও মন্তব্য করেন ঢাকা মহানগর এবং বিভিন্ন জেলার স্কুল-কলেজের প্রায় ১৫০ জন শিক্ষক।

সম্মিলনে 'ঢাকা মহানগরে পরিচালিত আউটরিচ কর্মসূচির সারসংক্ষেপ' এবং 'ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ' পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করা হয়। এতে মূলত দেখানো হয় নতুন পরীক্ষামূলক শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ রয়েছে বিভিন্ন বইয়ে। অন্যদিকে প্রাসঙ্গিক উপকরণ বা স্মারক সংরক্ষিত রয়েছে জাদুঘরের আর্কাইভে। এই স্মারকগুলোর কোনটা, কোনভাবে, কতটুকু কোন শ্রেণিতে ব্যবহার করা যাবে

বা সঙ্গত, সম্মিলনের মূখ্য আলোচ্য ছিল এটাই। স্বাগত বক্তব্যে ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পাঠ উপস্থাপনের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা যায়; শিক্ষকদের বড় দায়িত্ব হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের অংশ বাস্তবায়ন করা। যেখানে যেটুকু পাঠ রয়েছে তাকে আরও গ্রহণযোগ্য এবং যথার্থভাবে কী কী উপকরণ দিয়ে উপস্থাপন করা যায় সেটাই আমাদের দায়িত্ব। সম্মিলনগুলোতে শিক্ষকবৃন্দ মতামত তুলে ধরেন। তারা বলেন, কনটেন্ট তৈরি করে শিক্ষা দেয়া হলে তা ভালোভাবে শিশুদের কাছে গৃহীত হয়। আমরা নিজেরা কনটেন্ট তৈরি করি এবং বুঝতে পারি আরও ভালো কীভাবে করা যায়। শিশুরা শিক্ষকদের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ জানবে ফলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আমাদের নতুন কারিকুলাম অনুসারে মুক্তিযুদ্ধের পাঠের সংশ্লিষ্ট উপকরণ সব আমাদের হাতে নেই। সেগুলো যদি জাদুঘর সরবরাহ করে আমাদের সুবিধা হবে। কনটেন্ট তৈরি করে দেয়ার যে কথা বলা হচ্ছে সেটা হলেও ভীষণ কাজে আসবে আমাদের।

তারা আরও বলেন, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য আমাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সেটা করতে গিয়ে প্রথমে নিজেদের উদ্বুদ্ধ হতে হবে এই কারিকুলাম বাস্তবায়নে। কনটেন্ট তৈরি করতে আমাদের যুক্ত করার কথা জাদুঘর বলেছে। সেখানে কীভাবে যুক্ত হবো সেটা জানাতে হবে। তথ্যগুলো সহজলভ্য করার জন্য গুগল ড্রাইভে থাকলে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারবো।

সীমাবদ্ধাতা থাকবে; আমাদের যার যার অবস্থান থেকে কাজ করলেই এটা অতিক্রম করা যায়। কনটেন্ট তৈরির সময় শিক্ষকদের মাস্টার ট্রেইনাররা যদি জাদুঘরের সঙ্গে যুক্ত হন তারা সহজে বলে দিতে পারবেন কোন বিষয়ে কোন কনটেন্ট কতটুকু সময়ের হবে।

ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী তার বক্তব্যে বলেন, আমরা চাই মুক্তিযুদ্ধের বর্তমান তৃতীয় প্রজন্ম যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আগ্রহী হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে চারপাশের পরিস্থিতি, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং যোগ্যতা অর্জন করে টিকে থাকতে পারবে সাফল্যের সঙ্গে। আমরা চেষ্টা করছি আপনাদের মাধ্যমে কীভাবে শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন শিক্ষাক্রমের মুক্তিযুদ্ধের পাঠ শিশুদের পৌঁছে দেয়া যায়। সমাজের যেকোনো ধর্ম-বর্ণের মানুষ যে ছোটোবড়ো নয় এমন চেতনার একটা মানবিক সমাজ আমরা চাই। আমরা ধার্মিক যতটা হবো একইসাথে যেন মানবিকও হয়ে উঠি। শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ উপস্থাপন করে করণীয় সম্পর্কে বলেন, স্কুলে পর্যাপ্ত পরিমাণে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা করা, জাদুঘর থেকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তথ্যচিত্র সংগ্রহ ও সরবরাহসহ সকল নেটওয়ার্ক শিক্ষককে 'হোয়াটস এ্যাপ' গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করা

শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অভিন্ন কন্টেন্ট সরবাহ, আপডেট ও স্মার্ট কনটেন্ট তৈরি করে শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত নানা বিষয় তুলে ধরা, জাতীয় দিবসগুলোর তাৎপর্য, পেপার কাটিং ও Powerpoint Presentation-এর মাধ্যমে ক্লাসে উপস্থাপন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক তৈরি ওয়েবসাইট থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য সংগ্রহে করণীয় সম্পর্কে শিক্ষকবৃন্দ মন্তব্য করে জানান, বয়স্ক প্রত্যক্ষদর্শী খুঁজে বের করতে হবে, ভাষ্য সংগ্রহের সময়-স্থান নির্ধারণ করতে হবে, ভাষ্য সংগ্রহে শিক্ষার্থীকে দিক নির্দেশনা দিতে হবে, নিজ পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রতিবেশি, আত্মীয়দের কাছ থেকে ভাষ্য সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। সমাপনী বক্তব্যে ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, সকলে মিলে কাজের একটা রূপরেখা তৈরি করা গেছে। নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে দ্বিধা থাকতে পারে কিন্তু সবদিকে একটা প্রসারতা নিয়ে এসেছে। আপনাদের মাধ্যমে বাস্তবের নানা ধরণের বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা যে কাজটা করতে চাই সেখানে শিক্ষামন্ত্রণালয়কেও যুক্ত করা হবে কিন্তু শেষ বিচারে কাজটা স্বেচ্ছাকর্ম। সেখানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কী সহায়তা দিতে পারে; আমাদের কী উপকরণ আছে, সেগুলো শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনে যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হবে তার আলোকে কীভাবে ব্যবহার করা যায় সে কাজ শুরু করতে হবে। জাদুঘর, বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষকরা মিলেই এটা করবে। আমাদের লক্ষ হচ্ছে এই শিক্ষাবর্ষের মধ্যে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে যেন শিশুদের জন্য আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। সরকারের দিক থেকে একটা অঙ্গিকার আছে, যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি। ফলে যে পরিবেশ দরকার তা পাওয়া যাবে কিন্তু কাজটা করতে হবে একেবারে ভেতর থেকে। যারা এই সম্মিলনে উপস্থিত হয়েছেন এই কোর গ্রুপ নিয়েই কাজে অগ্রসর হতে হবে।

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠান

১৮ মে পৃথিবীব্যাপী পালিত হয়ে আসছে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস। দিবসটি ঘিরে এবছরের প্রতিপাদ্য– *টেকসইকরণ ও সমৃদ্ধিতে জাদুঘর*। প্রতিবারের মতো এবারও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দিবসটি পালন করেছে যথাযথ ভাবগাম্ভির্যের সাথে। এ উপলক্ষ্যে গত ১৭ মে ২০২৩ বুধবার বিকেল ৫টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সেমিনার কক্ষে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য প্রদান করেন হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ও ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব মিউজিয়ামস, বাংলাদেশ-এর সাবেক চেয়ারপার্সন জাহাঙ্গীর হোসেন। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের। সূচনা বক্তব্যে সারা যাকের বলেন, জাদুঘর বলতেই আমাদের মনে হতে পারে অনেক পুরনো একটা জায়গা, কিন্তু আমি মনে করি, পুরনো ধ্যানধারনা থেকে বেরিয়ে যেকোন জাদুঘরকে বর্তমানে নিয়ে আসতে হবে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে জাদুঘরকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে পারলে তবেই সেটা টেকসই হবে। কারণ জাদুঘরের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে এর বহমানতার উপর। যতো বেশি মানুষের পদচিহ্ন জাদুঘরকে স্পর্শ করে ততো বেশি সুস্থ থাকে একটি জাদুঘর। যতো বেশি নতুন প্রজন্মের মানুষ জাদুঘরে আসে, জাদুঘরের উদ্দেশ্য ততো বেশি সফল হয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে জাহাঙ্গীর হোসেনকে শুভেচ্ছা জানান। জাহাঙ্গীর হোসেন তার আলোচনার শুরুতেই ২০২২ সালে গৃহীত জাদুঘরের নতুন সংজ্ঞায়নের বিষয়ে আলোকপাত করেন। তারপর পৃথিবীব্যাপী জাদুঘরসমূহের আন্তর্জাতিক সংস্থা আইকম সম্পর্কে ধারনা প্রদান করেন। তিনি জানান, এই সংস্থার সাথে বর্তমানে পৃথিবীর ৪৫,৪৯৩ জন পেশাদার জাদুঘর ব্যক্তিত্ব, ১৩৮টি রাষ্ট্র, ১১৯টি জাতীয় কমিটি, ৩২টি আন্তর্জাতিক কমিটি, ৮টি আঞ্চলিক জোট এবং ২২ সংস্থা যুক্ত। জাদুঘর দিবস সম্পর্কে তিনি বলেন, যদিও ১৯৫৩ সাল থেকে দিবসটি অনানুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয়ে আসছিল কিন্তু ১৯৭৭ সাল থেকে দিবসটি আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয়ে আসছে এবং ১৯৯২ সাল থেকে দিবসটিকে ঘিরে একটি নির্দিষ্ট প্রতিপাদ্য ঠিক করা হচ্ছে। শুরু থেকেই প্রতিটি জাদুঘর দিবসে একটি আন্তর্জাতিক পোস্টার প্রকাশের রীতি চালু করা হয়েছে, যা সকলে ব্যবহার করে আসছে। মূলত আন্তর্জাতিকভাবে জাদুঘরসমূহের মধ্যে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা, সহযোগিতা প্রদান করা, তথ্যের প্রবাহ ঘটানো এবং বিশ্বময়ী দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করার লক্ষ্যে দিবসটি প্রবর্তন করা হয়। তিনি জানান, ২০১৯ সালের কিওটো রেজুলেশনের পর থেকে জাতিসংঘ প্রবর্তিত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রার সাথে মিল রেখে প্রতিপাদ্যগুলো ঠিক করা হয়ে আসছে। টেকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকরণে জাদুঘরের ভূমিকা কেমন হতে পারে উল্লেখ করতে গিয়ে জাহাঙ্গীর হোসেন তিনটি বিষয়ে আলোকপাত করেন ১. বৈশ্বিক টানাপোড়েন মোকাবিলা করা, ২. ইতিবাচক পরিবর্তন সূচনা করা ও ৩. পরিবেশগত প্রভাব মোকাবিলা করা। এবারের জাদুঘর দিবসের প্রতিপাদ্যের আলোকে জাহাঙ্গীর হোসেন জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বিজ্ঞান জাদুঘর, জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, পাহাড়পুর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, ময়নামতি জাদুঘর, লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জাদুঘরের চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত এই আলোচনা অনুষ্ঠানের প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ গ্রহণ করেন ঢাকাস্থ বিভিন্ন জাদুঘরের কর্মীবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম।

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে মূল বক্তা আইকম-এর সাবেক চেয়ারপার্সন জাহাঙ্গীর হোসেন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের

শরীফ রেজা মাহমুদ

সিএসজিজের ৯ম মাসিক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) গত ২৭ মে মাসিক ধারাবাহিক বক্তৃতামালার ৯ম পর্বের আয়োজন করে। এবাবের বক্তা ছিলেন সিএসজিজের সাবেক সমন্বয়কারী নওরীন রহিম। বর্তমানে তিনি অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে পিএইচডি রিসার্চ ফেলো হিসেবে শরণার্থীদের নিয়ে গবেষণারত রয়েছেন এবং এই গবেষণার অংশ হিসেবে 'বাংলাদেশ এ্যাস রিফিউজি হোস্টিং স্টেট: লিগ্যাল ইমপ্লিকেশনস ইন ডিলিং উইথ দ্য রোহিঙ্গা' শীর্ষক বক্তব্য প্রদান করেন।

বক্তব্যের শুরুতে তিনি জোরপূর্বক অভিবাসনের পটভূমি নিয়ে আলোচনা করেন এবং উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে ২৭.১ মিলিয়নেরও বেশি শরণার্থী রয়েছে এবং তার ৮৪ শতাংশ রয়েছে নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে। এর কারণ হিসেবে তিনি ১৯৫১ সালের রিফিউজি কনভেনশন ও এর ১৯৬৭ সালের রিফিউজি প্রোটোকলের সাথে এশীয় ও দক্ষিণ এশীয়দের সীমিত সম্পৃক্তাকে দায়ী করেন। তিনি আরও বলেন যে,আফগানিস্তান ছাড়া বাংলাদেশ এবং এর প্রতিবেশী দেশগুলি ১৯৫১ সালের রিফিউজি কনভেনশন এবং এর ১৯৬৭ সালের রিফিউজি প্রোটোকলের স্বাক্ষরকারী নয়।

এরপর তিনি বাংলাদেশে বিদ্যমান রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটের বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি সংক্ষিপ্তভাবে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে পালিয়ে যাওয়া বাঙালি শরণার্থীদের দুর্দশার কথা এবং বাংলাদেশের উর্দুভাষী সংখ্যালঘুদের বিষয়ে যুদ্ধোত্তর সরকারের দ্বিধা সম্পর্কে কথা বলেন। তার মতে, যদিও উর্দুভাষী সংখ্যালঘুদের ধীরে ধীরে নির্বাচনী অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এখন তাদের নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে, তবুও তারা এখনও সামাজিক বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছে। তার চলমান পিএইচডি ফিল্ডওয়ার্ক থেকে গবেষণার ফলাফলগুলো বিশ্লেষণ করে, ইউএনএইচসিআর-এর রেফারেন্স দিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, রোহিঙ্গাদের পাশাপাশি ইরান, ইরাক এবং আফগানিস্তানের মতো অন্যান্য জাতিসত্তা থেকে আসা শরণার্থীদের জন্যও বাংলাদেশ আশ্রয়কারী দেশ হিসেবে কাজ করছে।

১৯৫১ সালের রিফিউজি কনভেনশন এবং এর ১৯৬৭ সালের প্রটোকল স্বাক্ষর না করার জন্য বাংলাদেশের সিদ্ধান্তের বিষয়ে তিনি বলেন, কোন সরকারি নথিতে স্বাক্ষর না করার পেছেন কোন যুক্তির উল্লেখ নেই। তিনি আরও বলেন, যেহেতু ১৯৫১ রিফিউজি কনভেনশনের খসড়া তৈরির সময় দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর তেমন অংশগ্রহণ ছিলনা তাই এই কনভেনশনটি ইউরোসেন্ট্রিক হওয়ার কারণে বেশিরভাগ দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো এই কনভেনশন এখনও সমর্থন করে না। তবে কনভেনশন এবং এর প্রটোকল সমর্থন না করার বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত এই সকল ঐতিহাসিক বিষয়গুলো দ্বারা প্রভাবিত কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়।

তিনি মনে করেন, ১৯৫১ সালের রিফিউজি কনভেনশনের পক্ষ না হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ সম্মানের সাথে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আতিথেয়তা প্রদান করছে। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের (আরএমএমআরইউ বনাম বাংলাদেশ সরকার, ২০১৭) একটি রায়ে আদালত পর্যবেক্ষণ দিয়েছে যে, যদিও বাংলাদেশ ১৯৫১ সালের কনভেনশন অনুমোদন করেনি, তবুও এই কনভেনশনটি এখন রাষ্ট্রীয় অনুশীলনের মাধ্যমে প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হয়েছে এবং তাই বিশ্বের সব দেশ এর জন্য নির্বিশেষে এটি মেনে চলা বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে। ১৯৫১ সালের রিফিউজি কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী না হওয়া সত্ত্বেও, বাংলাদেশ ১৯৯৫ সাল থেকে ইউএনএইচসিআর-এর নির্বাহী কমিটির (এক্সকম) সাথে এবং ২০১৮ সাল থেকে গ্লোবাল কমপ্যাক্ট অন রিফিউজিস (জিসিআর)-এর সাথে যুক্ত রয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে শরণার্থী সংকট মোকাবিলায় জাতীয় আইনের অভাব থাকার কারণে এটি শিবির এলাকার ভিতরে এবং বাইরে দেওয়ানী এবং ফৌজদারি বিরোধের সমাধান সম্পর্কিত সমস্যার জন্ম দেয়। বর্তমানে বাংলাদেশের সংবিধান এবং ফরেনারস এ্যাক্ট, ১৯৪৬ এই ধরনের সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও যদি শিবিরের মধ্যে সহিংসতার উদ্বেগ থাকে, তাহলে কর্তৃপক্ষ বর্তমানে ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি প্রয়োগ করে তা সমাধান করতে পারে।

সবশেষে, তিনি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দীর্ঘস্থায়ী প্রত্যাবাসন সমস্যা নিয়ে উল্লেখ করেন যে, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে তা সমাধান সম্ভব। উপস্থিত সকলের প্রশ্ন-উত্তর পর্বের মধ্য দিয়ে নবম মাসিক বক্তৃতা শেষ হয়।

নুসাইবা জাহান, গবেষণা সহকারী, সিএসজিজে

মুক্তিযুদ্ধে পরিবার-প্রধানহারা নারীর জীবন সংগ্রাম নারীর ক্ষমতায়নের ভিন্ন প্রেক্ষাপট

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর **'মুক্তিযুদ্ধে পরিবার-প্রধানহারা নারীর জীবন সংগ্রাম: নারীর ক্ষমতায়নের ভিন্ন প্রেক্ষাপট'** শিরোনামে গবেষণা প্রকল্প শুরু করেছে। এই গবেষণা প্রকল্পে মাঠ পর্যায়ে গবেষণার দায়িত্বে থাকবেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ১৬ জন নেটওয়ার্ক শিক্ষক, যারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যালয় এবং কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকতা করার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে নানা কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে গত ৯ জুন ২০২৩ কর্মশালার আয়োজন করা হয় ক্ষেত্র গবেষকদের জন্য। শুরুতে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গবেষণাকর্মের গুরুত্ব ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করে জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী উল্লেখ করেন, মুক্তিযুদ্ধ একটি বহুমাত্রিক ঘটনা, তবে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক শূন্যতা রয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে এমন প্রায় ৭৬৪২টি বই রয়েছে (২০২১ সালে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী)। কিন্তু এর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা কর্মের সংখ্যা ৬৭টি। এই শূন্যতা পূরণ করার বিষয়ে তিনি বলেন, গবেষণার সঙ্গে রাষ্ট্রের নীতি এবং সমাজ গবেষণার প্রভাব খতিয়ে দেখতে হবে। এছাড়া তিনি সতর্ক করেন যে, এক্ষেত্রে অতিরঞ্জন পরিহার করতে হবে; কোন ঘটনা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে কি না, সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং যুক্তিকে প্রাধান্য দিতে হবে। একইসাথে সঠিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণের কথাও তিনি বলেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে গবেষণালব্ধ ফলাফলের প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন করাও জরুরি। মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান বলতে কেবল ধর্ষিত নারীদের পরিস্থিতি বোঝায় না, সেটাও বিবেচনায় রাখতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্রন্থাগার ও গবেষণা বিভাগের ব্যবস্থাপক ড. রেজিনা বেগম বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন পরিমাপ করবার জন্য দু'ধরনের পরিমাপক ব্যবহার করা হয়। একটি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অপরটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা। তিনি উল্লেখ করেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীদের ঘর ছেড়ে বাইরের জগতে এসে যুদ্ধে যোগদান কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করা আমাদের দেশের নারীদের ক্ষমতায়নে ভিন্ন প্রেক্ষাপটের সূচনা করে। কর্মপরিকল্পনার ওপর আলোকপাত করে তিনি উল্লেখ করেন, গবেষণায় নির্বাচিত বিভিন্ন জেলা থেকে ১৬ জন নেটওয়ার্ক শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধে পরিবার-প্রধানহারা সংগ্রামী ১০ জন নারীর সাক্ষাৎকার, সংগ্রামের ইতিহাস ও বিবরণী সংগ্রহ করবেন;

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মাঠ পর্যায়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়ে আলোকপাত করে উল্লেখ করেন, একাধিক সূত্র ব্যবহার করে তথ্যের সত্যতা নিরূপণ করতে হবে। তথ্যের যথার্থতা যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত শহিদ পরিবারের তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে যে গবেষকবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা করছেন, ক্ষেত্র গবেষকরা তাদের সহায়তা নিতে পারেন বলে তিনি পরামর্শ দেন। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জি এবং টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে তথ্য সংগ্রহের দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধকালীন শহিদদের শেষ সময়, হত্যার বিবরণ কিংবা মৃতদেহ তথ্য প্রদানকারীর পরিবারের কাছে পৌঁছেছিল কি না বা কোন খোঁজ পেয়েছিলেন কি না, ক্ষেত্র গবেষকদের তা জানবার চেষ্টা করতে হবে। নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের ভূমিকা এবং নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় প্রসঙ্গে জাদুঘর ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, শহিদ পরিবারের লড়াই এবং বিধবা নারীদের প্রান্তিকতার চিত্র ফুটিয়ে তোলাই হবে এই গবেষণাকার্যের মূল লক্ষ্য। ক্ষেত্র-গবেষকবৃন্দ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্তব্য পালন করবেন। তিনি আরো বলেন যে, শহিদ জায়ার বিস্তারিত সাক্ষাৎকার নেয়ার পর সন্তানদের মূল্যায়ন সাক্ষাৎকারের শেষদিকে এসে গ্রহণ করা যেতে পারে। যুদ্ধ-পূর্ববর্তী, যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে শহিদ জায়া তথা জননীদের জীবনের সামগ্রিক দিক জানবার চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া তিনি আরো বলেন, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্যের কারণে সংগ্রামের চিত্র ভিন্ন ভিন্ন ছিলো। সেক্ষেত্রে কোন নারীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য বাছাই করা হবে, এই প্রশ্নের আলোকে তিনি নারীর সামাজিক অবস্থানের বৈচিত্র্য প্রতিফলিত করার দিকে প্রাধান্য দিতে বলেন। তিনি আরো বলেন, প্রান্তিক নারী, আদিবাসী নারী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নারীর অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা করা হবে।

কর্মশালায় উপস্থিত নেটওয়ার্ক শিক্ষকবৃন্দ তাদের অভিজ্ঞতা এবং সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ করেন। পরিশেষে নেটওয়ার্ক শিক্ষকবৃন্দ তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, পাশাপাশি তারা বলেন, শহিদ জায়াদের বড়ো একটি অংশ বর্তমানে জীবিত নেই, তবে যারা বর্তমানে বেঁচে আছেন তাদের ভাষ্য সংগ্রহ করা গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব, এই দায়িত্ব তারা সর্বোচ্চ নিষ্ঠা এবং শ্রম দিয়ে পালন করবেন।

ফরেন সার্ভিস একাডেমির ২৯তম বিশেষায়িত কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশগ্রহণকারীদের জাদুঘর পরিদর্শন

৫ জুন ২০২৩ বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমির এক বছর মেয়াদী ২৯তম বিশেষায়িত কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণ ও বিদেশী কূটনীতিকরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। একাডেমির রেক্টর মাশফি বিনতে শামস্-এর নেতৃত্বে মহাপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও সহযোগীরা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক চন্দ্রজিৎ সিংহ ও ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম জাদুঘর প্রাঙ্গণে তাদের স্বাগত জানান। পরিদর্শনের শুরুতে রফিকুল ইসলাম সেমিনার হলে জাদুঘর ও প্রদর্শনী গ্যালারি বিষয়ে একাডেমির কর্মকর্তাদের সম্যক ধারণা প্রদান করেন। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস' প্রদর্শন করা হয়। প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন শেষে কর্মকর্তাগণ জাদুঘরের গ্যালারিসমূহ পরিদর্শন করেন।

গ্যালারি পরিদর্শন শেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক একাডেমির কর্মকর্তাদের সাথে সেমিনার হলে সংক্ষিপ্ত আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় ট্রাস্টি মফিদুল হক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও সংগ্রাম নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ ও ১৯৭১-এ সংঘটিত গণহত্যার বিচার ও স্বীকৃতির জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চলমান কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা পর্বের শেষে একাডেমির কর্মকর্তাদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর দেন মফিদুল হক।

বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমির পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকের হাতে স্বারক উপহার প্রদান করেন একাডেমির রেক্টর মাশফি বিনতে শামস্ ।

হাসিব চৌধুরী, অনুষ্ঠান সহকারী, সিএসজিজে

মু|ক্তি|যো|দ্ধা|র || ভা|ষ্য

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুস সামাদ

১৯৬৬ সালে আমি কলেজে পড়বার সময় ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যুক্ত হই। সে সময় ছয়দফার দাবীতে প্রথম মিছিল মিটিং-এ যাওয়া শুরু করি। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময়ে আমার ওপর দায়িত্ব পড়ে সারা যশোর শহরে মিছিল করার বিষয়ে ঘোষণা দেয়ার। আমি এবং ফকরুজ্জামান নামে একটা ছেলে সমস্ত শহরটা রিক্সা যোগে মাইকিং করতাম। সত্তরের নির্বাচনের পর আমরা বুঝে গেলাম যুদ্ধ ছাড়া কোন উপায় নাই। ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের সময় আমি ঢাকাতে এসেছিলাম। ওনার ভাষণ শুনে আর কোন সন্দেহ থাকলো না যে যুদ্ধ ছাড়া আমাদের আর কোন পথ নাই। বাড়িতে গিয়ে সেনা বাহিনীর একজন বাঙালি হাবিলদারের কাছে আমরা কয়েকজন ডামি রাইফেল দিয়ে ট্রেনিং নেয়া শুরু করি, তেজপাড়া কবরস্থানের কাছে একটা পোড়বাড়িতে। যখন সামরিক জান্তা জানতে পারলো আমরা এখানে ট্রেনিং নিচ্ছি, তারা আমাদের খোঁজা শুরু করলো। তিন সপ্তাহ ট্রেনিং-এর পর আমরা সবাই পালিয়ে গেলাম। তার আগে ২৫ মার্চ রাতে সেনাবাহিনী যেন শহরে ঢুকতে না পারে সেজন্য আমাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হলো ব্যারিকেড দেওয়ার। আমার নেতৃত্বে ছিলো একটা গ্রুপ। আমরা যশোর শহরের হাউজিং-এর পাশে ব্রিজের ওপর ব্যারিকেড দিলাম। রাত তিনটার দিকে ওরা এলো ব্যারিকেড ভাঙবার জন্য। তখন পর্যন্ত আমাদের হাতে কোন অস্ত্রপাতি ছিল না। আমরা রাতটা অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। আর্মির লোকেরা আমার বাড়ি এলো আমাকে খুঁজতে। খুঁজে না পেয়ে ভাংচুর গালিগালাজ শুরু করলো। অন্যদের বাড়িতেও একই ঘটনা ঘটালো। পরদিন থেকে কারফিউ দিল। ২৭ মার্চ রাতে আমরা পুলিশ লাইনের তালা ভেঙে সামান্য কিছু থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল যোগাড় করতে পেরেছিলাম। ২৯ তারিখ এক ঘন্টার জন্য কারফিউ শিথিল হলে আমরা সে সুযোগে পালালাম। ৫/৬ মাইল দূরে বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসে আমরা আশ্রয় নিলাম। এরপর যখন ওরা ক্যান্টনমেন্ট ব্যাক করলো তখন শহরে ফিরে এলাম। শিক্ষা বোর্ড থেকে একটা গাড়ি নিলাম প্রতিরোধের দায়িত্বে থাকা সহকর্মীদের জন্য খাদ্য সরবরাহের কাজে। তারপর ঝিকরগাছা যাই বর্ডার এলাকা থেকে ভারতের দেওয়া ওষুধপত্র আনতে। কিন্তু শহরে ঢোকার মুখে ততক্ষণে ভারি অস্ত্র নিয়ে সেনাবাহিনীর চেকপোস্ট বসে গেছে। আমি মনিরামপুর দিয়ে ঘুরে শহরে ঢোকার চেষ্টা করি। রাজারহাটে এসে আমাদের প্রথম গাড়ির আব্দুল হাই সামনের চেকপোস্ট দেখে হাত উঁচু করলো, সাথে সাথে ফায়ার শুরু হলো। আমাদের পরপর তিনটা গাড়ি ছিল। হাই গাড়ি থেকে মাটিতে ঝাঁপ দিলো। রবিউলদের গাড়িতে ফারুক নামে একটা ছেলে এবং আমাদের পেছনের গাড়ির নিখিল নামে আরেকটা ছেলে সেখানে শহিদ হয়। সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। আমি আর স্ফুলিঙ্গ পত্রিকার মাহফুজ নদীতে কচুরিপানার ভিতর আশ্রয় নিলাম। আর্মিরা চলে যাওয়ার পর আমরা নদী পার হয়ে একটা মুচি বাড়িতে গিয়ে কাপড় পরিবর্তন করে জগন্নাথপুর গেলাম। রাত কাটিয়ে শহরে আসার পথ না পেয়ে গ্রামের বাড়ি চলে গেলাম। লোকজন ভারতে যাওয়া শুরু করে দিয়েছে। এপ্রিলে শেষের দিকে আমরা তিনজন আমি, জবেদ ও রতন বর্ডার পাড়ি দিয়ে বনগাঁওয়ে আওয়ামী লীগ অফিসে রিপোর্ট করি। আমাদেরকে অভয়াশ্রম নামক রেল স্টেশনের পাশে একটা সেনিটেশন ট্রেনিং ক্যাম্পে নেওয়া হয়। মে-জুন ট্রেনিং হলো। জুলাইতে কলকাতার সদর স্ট্রিটে অখিল ভারত শান্তিসেনা'র একটা মিটিংয়ে আমাদের ডাকা হলো। মিটিংটি ছিল বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রার। সেপ্টেম্বরের শেষে বলা হলো অক্টোবরের ১৫ তারিখ আমাদেরকে যেতে হবে। ১৪ তারিখ বনগাঁ স্টেশনে রওশন আলী, হাদিউজ্জামান, তৈবুর রহমান সরদারসহ এমপি ও এমএলএরা আমাদের বিদায় দিলেন। কথা ছিল তৎকালীন ১৯ জেলার ৩৮ জন যাবো। কিন্তু আমরা বহরমপুরে গিয়ে ৩৪ জন মিলিত হলাম। ১৫ তারিখ বহরমপুর থেকে হাঁটা শুরু করি। বিভিন্ন জেলা পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়ে, পশ্চিমবঙ্গ হয়ে বিহার, উত্তর প্রদেশ গেলাম। পাটনায় থাকাকালীন সময় আরও চার সদস্য যুক্ত হলেন। ডিসেম্বরের ৬ তারিখ বিহারের কুদরা নামক একটা জায়গায় বসে আমরা জানতে পারলাম ভারত এবং ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে ভারতের অবাঙালিদের জানানোই ছিল আমাদের মূল কাজ। তাছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায় করা, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও গণহত্যা বন্ধের দাবিতে বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করতেই মূলত আমাদের এই পদযাত্রা। দুই দেশের স্বীকৃতি প্রদানের ফলে আমরা খুব উজ্জীবিত হলাম। ১৬ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের কানপুরে থাকাকালীন আমরা যুদ্ধ বিজয়ের ঘোষণা শুনতে পেলাম। ১৮ তারিখ লখনৌতে আমারা বিজয়র‍্যালি করার মধ্য দিয়ে পদযাত্রা শেষ করলাম। ১৯ ডিসেম্বরে আমরা সদর স্ট্রিট কলকাতায় ফিরে আসি। তিন মাস আমরা পথে হেঁটে হেঁটে ভারতের জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে জনমত তৈরি করেছি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করাই ছিল এই পদযাত্রার মূখ্য উদ্দেশ্য।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : **শরীফ রেজা মাহমুদ**

আন্তর্জাতিক আইন, বিচার ও গবেষণা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও পাপুয়া নিউগিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপক ইসলাম আন্তর্জাতিক আইন অঙ্গনে একজন সক্রিয় শিক্ষাবিদ ও গবেষক হিসেবে কাজ করছেন। তার অধিকাংশ প্রকাশিত গ্রন্থে তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়।

পরিচয় পর্ব শেষে মূল আলোচনা শুরু হয় বক্তাকে করা বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে। সমকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে অধ্যাপক ইসলাম বলেন, আন্তর্জাতিক আইন শোচনীয় অবস্থায় আছে। শুধু সাম্প্রতিক সময়ে না, প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এই অবস্থা চলমান, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে এই আইনের গুরুত্বের ব্যাপারে বারংবার বলা হলেও এর তেমন সুফল পাওয়া যায়নি। তার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন, প্রতিটি আইনই সেটা জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক হোক না কেন রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিফলন। আন্তর্জাতিক আইন বেশিরভাগই ইউরোপ কেন্দ্রিক। তিনি আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাস ও কার্যকরিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এর উৎসসমূহের সমালোচনামূলক আলোচনার প্রতি জোর দেন। তার বক্তব্যে উঠে আসে আন্তর্জাতিক আদালত আন্তর্জাতিক আইনের কোন বিচার ব্যবস্থা নয়, এটি জাতিসংঘের বিচার ব্যবস্থা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ ও অনুশীলন নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। সেই সূত্র ধরে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক আইনের ব্যবহার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আইনের অধ্যয়নের ব্যাপারে তার মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক আইনের ভূমিকা সমুদ্রসীমা, সীমান্ত ইস্যু, জলবায়ু পরিবর্তনসহ স্বার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকা দরকার প্রথমে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মৌলিক সমসাময়িক বিষয়গুলো শুরু করতে হবে। একই সাথে শিক্ষকদেরও দক্ষতা অর্জনের জায়গা আছে। শিক্ষার মান নির্ভর করবে , কে শিক্ষা দিচ্ছে এবং কোন পদ্ধতিতে দিচ্ছে সেই বিষয়াদির উপর। প্রতি ছয় মাস অন্তর শিক্ষকদের কৌশলগত পরিবর্তন আনতে হবে পাঠদান এর ক্ষেত্রে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আইনের প্রতি নজর দেন। ৭১ -এ ঘটে যাওয়া গণহত্যার বিষয়ে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, নৈতিকতা ও মর্মের বর্তমান অবস্থানের ধারনা পাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক আইনের প্রেক্ষাপটে আরো গভীর গবেষণা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান, কেবল প্রমোশনের জন্য দায়সারা গবেষণা না করে, তারা যেন টেকসই ও গঠনমুলক গবেষণা করে তা বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিয়ে তিনি বলেন, সকল ট্রাইব্যুনালেরই সমালোচনা ও ঘাটতি রয়েছে। বিচারিক আদালতে মামলা বিলম্বের বিষয়টি টেনে তিনি বলেন, আইন অনুযায়ী যতক্ষণ না অভিযুক্ত দোষী প্রমাণিত হবেন, ততদিন অবধি সে নিরপরাধ, এখন যদি কেউ বিচার চলা অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সে নিরপরাধ হিসেবেই মারা যাবে। এই ব্যাপারে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন নুরেম্বার্গ ট্রায়াল যদি গ্রহণযোগ্যতা পায় এত সমস্যা থাকা সত্বেও, তাহলে বাংলাদেশের ট্রাইব্যুনালেরও গ্রহণযোগ্যতা না পাওয়ার কারণ দেখিনা। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম গর্বের সাথে বাংলাদেশের এই ট্রাইব্যুনালকে এশিয়ার নুরেম্বার্গ ট্রাইব্যুনাল হিসেবে অভিহিত করেন। ২০১২ সালের কাদের মোল্লা মামলার এক রায়ের বরাত দিয়ে বলেন, আলোচ্য বিষয় ছিল কতজনকে হত্যা করলে গণহত্যা হয়েছে বলে অভিহিত করা যায়? সেই রায়ে বলা হয়, যদি একজন মানুষকেও কোন উদ্দেশ্য নিয়ে হত্যা করা হয় সেটাও গণহত্যা বলে গণ্য হবে। উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, ঠিক ২০১৫ সালে বসনিয়া ট্রাইব্যুনালে একই কথা বলা হয়। বাংলাদেশের গণহত্যা ও আন্তর্জাতিক আইন প্রশ্নে শিক্ষার্থী ও গবেষকদের ভূমিকা রাখার প্রতি জোর দেন তিনি। একই সাথে আন্তর্জাতিক আইন অঙ্গনে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর কথাও বলেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন ও আন্তর্জাতিক আইনের ভূমিকা ও গুরুত্ব নিয়ে কৌতূহলের উপর মতামত দেন অধ্যাপক এম রফিকুল ইসলাম। উল্লেখ্য, অধ্যাপক এম রফিকুল ইসলাম তার সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ **"ন্যাশনাল ট্রায়ালস অফ ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ইন বাংলাদেশ"** মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের লাইব্রেরিতে প্রদানের জন্য ট্রাস্টি মফিদুল হকের হাতে হস্তান্তর করেন।

সবশেষে সিএসজিজের পক্ষ থেকে সমন্বয়ক ইমরান আজাদ প্রধান বক্তার হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন।

মো. হাসিব চৌধুরী
অনুষ্ঠান সহকারী, সিএসজিজে

শহরতলীতে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

প্রাত্যহিক সমাবেশে বেগুনবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখছে আক্রান উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা

নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের ইতিহাস পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর পার্শ্ববর্তী তুরাগ নদী তীরের গোলাপগ্রাম খ্যাত বিরুলিয়া এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন শুরুর পূর্বে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষা কর্মসূচির বিষয়ে এবং বাড়ির কাজ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী-ভাষ্য সংগ্রহের আহ্বান জানানো হয়। তীব্র গরমের কারণে প্রদর্শনীর নির্ধারিত দিনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কিছুটা কম ছিল। জাদুঘরের এই শিক্ষা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধের অনেক অজানা ইতিহাস সর্ম্পকে জানতে পেরেছে।

বেগুনবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, আক্রাণ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, রেনেসা কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড হাই স্কুল ও আক্রান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। তিনদিনের শিক্ষা কর্মসূচিতে পাঁচটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১৭৩০ জন শিক্ষার্থী, ২৯৩০ জন সাধারণ দর্শক ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও প্রমাণ্যচিত্র প্রদর্শনী দেখেন।

রঞ্জন কুমার সিংহ

দ্বিতীয় পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহের সূচনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একসময় যেসব তরুণ কর্মী স্বেচ্ছাসেবীর মানসিকতা নিয়ে এই জাদুঘরে কাজ শুরু করেছিল আজ তারা পেশাদারিত্বের সাথে জাদুঘরটা চালায়। আমি এই তরুণদের নিয়ে গর্ববোধ করি। এদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন এখন। ২০১৯-এর নভেম্বর থেকে ২০২০-এর নভেম্বরের মধ্যে আমরা তিনজন প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টিকে হারাই। সেই সন্ধিক্ষণে আমরা একটা ধাক্কা খাই। তখন থেকে আমরা চিন্তা করতে শুরু করি একটা বিকল্প জাদুঘর ব্যবস্থাপনার বিষয়ে। সেই লক্ষে আমরা কাজ শুরু করি। গত ২৭ বছর আমরা যেভাবে জাদুঘরকে সুন্দরভাবে চালিয়ে নিয়ে এসেছি আগামী একশ বছর এই জাদুঘর সেভাবেই যেনো পরিচালিত হতে পারে। এখন সময় এসেছে রিলে রেসের ব্যাটনটা পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেয়ার। সবার আগে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে একটা স্থায়ী তহবিল। এটাকেই আমরা বলছি দ্বিতীয় পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহের সূচনা। আমরা স্বপ্ন দেখছি একশ কোটি টাকার একটা তহবিল সংগ্রহ করার। যাতে করে নিজস্ব ক্ষমতায় জাদুঘরকে পরিচালনা করা যায়। আমরা যেন নিজেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠান চালাতে সক্ষম থাকি সবসময়। সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। আপনারা যারা আজ অনুদান দিতে এসেছেন, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। এরপর বিভিন্ন ক্যাটাগরির অনুদানদাতাদের স্মারক প্রদান করা হয়। স্থাপনা সদস্য হিসেবে স্মারক গ্রহণের পর শুক্লা সিরাজ শুভেচ্ছা বক্তেব্যে বলেন, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্মের একজন মানুষ। মুক্তিযুদ্ধ আমি দেখিনি। মুক্তিযুদ্ধের কথা আমি শুনেছি, পড়েছি। আমাদের প্রজন্মের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এক আলোকবর্তিকা। আমি আমার মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্মের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিকাশ (bKash)-এর সিইও কামাল কাদির বলেন, সারওয়ার ভাই চুকনগরের গল্পটা বললেন, ভাবছিলাম, আমার বাবা ১৯৭১ সালে খুলনা থেকে আমাদের নিয়ে বের হয়ে চুকনগরের দিকে না গিয়ে নড়াইলের দিকে যান। ভাগ্যবশত আমাদের কোন বিপদ হয়নি। না হয় আজ হয়তো এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না। আমার বাবা স্বাধীনতার ছয় মাস পর এক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। গতবছর বাবার মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি এবং আমার স্ত্রী ঠিক করলাম অন্য কিছু না করে বাবার নামে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সদস্যপদ নেব। আমি নিশ্চিত সকলে এগিয়ে আসলে সারা আপা যে লক্ষ্যের কথা বললেন, সেই লক্ষ্যটা অর্জন করা সম্ভব হবে। প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক তার বক্তব্যে বলেন, আজকের দিনটা আসলেই অত্যন্ত আনন্দের দিন। অঙ্গীকারের দিন। প্রত্যাশার দিন। ১৯৯৬ সালে ২২ মার্চ যেদিন জাদুঘরের যাত্রা শুরু হয়েছিল আজকে সেই দিনের কথা খুব মনে পড়ছে। বৃষ্টিস্নাত সেই বিকেলের কথা। বাংলাদেশের ইতিহাসে যখন ইতিহাসের অস্বীকৃতি চলছিল, ইতিহাসের বিকৃতি, ইতিহাসের বিস্মৃতি তখনই এই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। আর মনে পড়ছে আমাদের তিনজন প্রয়াত ট্রাস্টির কথা। রবিউল হুসাইন, আলী যাকের ও জিয়াউদ্দিন তারিক আলীকে। খুব বেশিই তাদের কথা মনে পড়ছে। আক্কু চৌধুরীর কথা মনে পড়ছে। দেশে নেই তিনি। তাকেও স্মরণ করছি আজ। আমরা খুব ভালো করেই জানতাম আটজন মানুষের ক্ষমতা নাই একটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করার, যদি না দেশের আপামর জনসাধারণের সহায়তা প্রসারিত হয়। যদি না সমাজের শক্তি এই জাদুঘর নির্মাণে অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে। শুরু থেকেই সেটা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। আমরা অনেক স্মারক পেয়েছিলাম। অনেকভাবে ইতিহাসের উপস্থাপন প্রথম দিন থেকেই করা গিয়েছিল। বহু মানুষ এই জাদুঘরকে স্মারক জুগিয়েছে। ফলে এই জাদুঘরটি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বৃহত্তর তথ্য ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। আমরা যে স্বপ্নটুকু দেখেছিলাম তারচেয়েও বড় হয়েছে এই অর্জন। মানুষের শক্তিতে, সমাজের শক্তিতে এটা আমরা অর্জন করতে পেরেছি। আজকের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহের অভিযানে যারা এখানে যুক্ত হয়েছেন সকলের প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। তারা একটি প্রেরণা ও উদাহরণ হিসেবে কাজ করবেন। সম্প্রতি ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশ নামক একটি গোষ্ঠী, 'রান ফর ফ্রিডম' শিরোনামে একটি মিনি ম্যারাথনের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তহবিল সংগ্রহের বার্তাটা এর মাধ্যমে তারা প্রচার করতে চান। এর আগেও ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের স্কুলগুলো থেকে একটা বিস্ময়কর সহায়তা আমরা পেয়েছি। সত্যিকার অর্থেই এটা একটা জনগণের জাদুঘরে পরিণত হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নতুন প্রজন্ম ক্রমেক্রমে এর দায়িত্বটা গ্রহণ করছে। আমরা খুব আশাবাদী 'তোমার পতাকা যারে দাও...' সেই পতাকা নেওয়ার জন্যে একটা প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে নানাভাবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সেখানে ভূমিকা পালন করছে। বেলা শেষের রাগিনী আমাদের।

নতুন প্রজন্ম কাজটি অব্যাহত রাখবে। সবার কল্যাণ হোক। মফিদুল হকের বক্তব্য শেষে আইএফআইসি ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর গীতাঙ্ক দেব দত্ত ও তার সহধর্মিনী এবিসি রিয়েল স্টেটের পরিচালক শ্রাবন্তী দত্ত এবং শ্রাবন্তী দত্তের পিতা সুভাষ ঘোষ তিন জনে পাঁচ লক্ষ করে টাকা দিয়ে জাদুঘরের উদ্যোক্তা সদস্যপদ গ্রহণ করেন। সমাপনী বক্তব্যে ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি বলেন, শুরু থেকেই আমরা একটা জিনিস চর্চা করেছি যে, কে প্রতিষ্ঠা করেছে এটা বড় কথা নয়, এটি এ দেশের মানুষের জাদুঘর, জনগণের জাদুঘর। সেই ভাবনা থেকেই আমরা সকল মানুষকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে সম্পৃক্ত করেছি। সেগুনবাগিচার জাদুঘরে আমার নিজের চোখে দেখা একজন রিক্সাওয়ালা রিক্সাটা থামিয়ে আমাদের অনুদান বাক্সে অর্থ দিয়ে গেছে। কতো দিয়েছে জানি না। এভাবেই সকলের সহায়তায় জাদুঘরটা গড়ে উঠেছে। আমরা একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছি, অন্যদিকে তা নতুন প্রজন্মের মনের মধ্যে প্রথিত করার চেষ্টা করেছি। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের আবেগ যেভাবে কাজ করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে সেটা সেভাবে কাজ করবে না এটা স্বাভাবিক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ থেকে একশো বছর পর কোথায় যাবে সেটা কিন্তু এখন থেকে ভাবতে হবে। আমাদের মর্ম মূলে গাঁথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দেয়া যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। আপনারা যারা আজকে এগিয়ে এসেছেন আমাদের বার্তা আপনাদের পরিচিতদের মাঝে ছড়িয়ে দেবেন। সকলের সহায়তায় আমরা নিশ্চয় দ্বিতীয় পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহের অভিযানে সফল হতে পারবো। সকলের মঙ্গল হোক।

চা-চক্রের মধ্য দিয়ে এই আনন্দঘন আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে।

শরীফ রেজা মাহমুদ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সংগৃহীত মৌখিক ভাষ্য

নজর যায় লাহ্‌ম্রাসাং মারমার উপর

১৯৭১ সালের উত্তপ্ত বছরের এক সময়। চারিদিক ছিল যুদ্ধের ডামাঢোল। ঘুম ভাঙে বোমা ও গুলির আওয়াজে। সারাদেশের ন্যায় খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলায় চলছিল মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি বাহিনীর সংঘর্ষ। পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে এই মহান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। প্রথমত মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের মাটিতে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে প্রত্যক্ষ এবং কেউ পরোক্ষভাবেও অংশগ্রহণ করেছিল। এই সকল বিষয়গুলো পাকিস্তানিদের দৃষ্টি এড়ালো না। পাকিস্তানিরা আদিবাসী ও বাঙালি গ্রামগুলোতে হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন চালাচ্ছিল; যা কিনা নিত্য নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

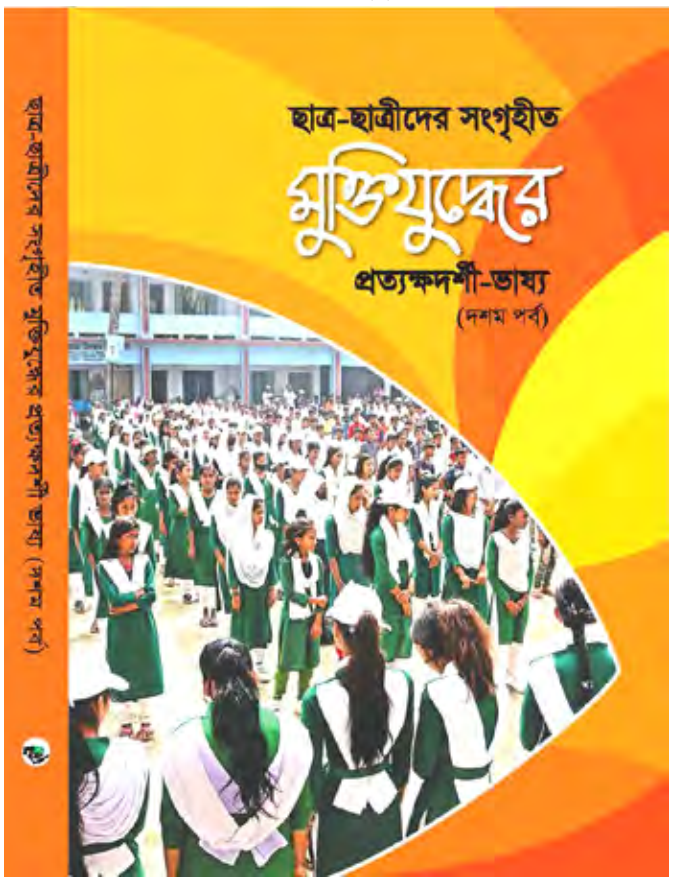

হানাদাররা নিয়মিতই গ্রামে গ্রামে টহল চালাতো। এমনি একদিন টহলরত অবস্থায় চোখ পড়ে খ্রংসং মারমা নামে এক আদিবাসী তরুণীর উপর। ক্যাংহরী মারমা নামে এক ব্যক্তিকে পাকিস্তানি সৈনিক নির্দেশ করে যে, উক্ত তরুণীকে যদি তাদের হাতে তুলে দেওয়া না হয় তাহলে তাকে এর খেসারত দিতে হবে। তাই নিরুপায় হয়ে উক্ত সৈনিক আরও কিছু পাকসৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে উক্ত তরুণীর গ্রামে (বাবুপাড়া) হানা দেয়। কিন্তু খ্রংসং মারমা ছিল থংয়ংম্র মারমা নামক স্থানীয় বাজার চৌধুরীর মেয়ে। কিছুটা প্রভাবশালী হওয়ায় আগাম সতর্কতায় তারা অন্য এক স্থানে আত্মগোপন করেন। ফলে ক্যাংহরী ও তার সহযোগীরা খুঁজতে খুঁজতে একসময় তাদের নজর যায় অন্য এক বিবাহিত নারী এবং তিন সন্তানের জননী লাহ্‌ম্রাসাং মারমার উপর। লাহ্‌ম্রাসাং মারমা ছিলেন একজন খেটে খাওয়া দিনমজুর এবং হত দরিদ্র মহিলা। ক্যাংহরী তার সবকিছুই জানতো। এমনকি তিনিও এর সুযোগ নিলেন। ঠিক সাড়ে ছয়টায় লাহ্‌ম্রাসাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে চলে অমানবিক নির্যাতন। লাহ্‌ম্রাসাংকে প্রথমাবস্থায় মারধর করা হয়। মারধরের পরে তাকে জোর করে মাদক খাওয়ানো হয়। তারপর এক একে পালাক্রমে ধর্ষণ করা হয়। অতঃপর রাত দুইটায় রাস্তার পাশেই কিছু শুকনো ভাত দিয়ে ফেলে রেখে চলে যায়। অবলা নারী উক্ত ভাতের থালাটা নিয়েই বাড়ির দিকে রওনা হন। কেননা ঘরে দুই মেয়ে আট-নয় বছরের এবং ছয় মাসের কোলের বাচ্চাটা তখনো অভুক্ত ছিল।

ঘরে স্বামীর বঞ্চনা তাকে সহ্য করতে হয়েছে। পাশাপাশি এলাকার বহু মানুষের কুটুক্তি আজও তাকে সহ্য করতে হচ্ছে। নিজের জীবনের ভয়ংকর স্মৃতির কথা মনে করে আজও তিনি আঁতকে ওঠেন।

তিনি আরও বলেন যে, ১৯৭১ সালের ওই রাতের ঘটনা তার পরবর্তী জীবনকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছিল। দারিদ্র্যের সাথে সাথে নানারকম বঞ্চনাও তাকে সহ্য করতে হয়েছিল এবং এখনো প্রতিনিয়ত হচ্ছে। পরে আত্মহত্যাও করতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিফল হন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার এত বছর পরও তিনি কিছুই পাননি। সারাজীবন পেয়েছেন শুধু বঞ্চনা এবং অবহেলা।

সংগ্রহকারী হিসেবে আমি প্রত্যক্ষ করলাম, ঘর বলতে দুই কক্ষ বিশিষ্ট ছোট্ট বাঁশ নির্মিত ঘর তাও আবার ২০০৩-৪ সালের দাঙ্গায় ভস্মীভূত। পরবর্তীকালে ইউএনডিপির অর্থায়নে তা পুনঃনির্মাণ করা হয়। খাবার বলতে প্লাস্টিকের বয়ামে কিছু শুকনো মুড়ি ও চিড়া। মানুষের কাছে হাত পেতেই জীবিকা নির্বাহ করেন এই বীরাঙ্গনা। অন্যের দয়ায় তার জীবন অতিবাহিত হয়। তিন সন্তানের মধ্যে ছোট মেয়ে ৭১ সালের কোলের বাচ্চা চোসেংদা বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। বাকি দুইজন পংশেদা মারমা (৫৬) এবং মংশাজেং (৫১) দিনমজুরের কাজ করছেন। প্রত্যেকেই বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। আর বীরাঙ্গনা লাহ্‌ম্রাসাং মারমার বয়স ৮৩ বছর। মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। শেষ জীবনে এসে পৃথিবীর কারুর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকলেও অন্তিম ইচ্ছাটি হলো- মৃত্যুর আগেই যেন বীরাঙ্গনা উপাধিটা পান।

সূত্র : ২৯৮৫৩

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
উষাচিং মারমা	**লাহ্‌ম্রাসং মারমা (বীরাঙ্গনা)**
মাটিরাঙ্গা মডেল হাই স্কুল	গ্রাম : বাবু পাড়া, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি
৯ম শ্রেণি	বয়স : ৮৩

গায়ের রক্ত চেটে খায় শিয়াল

১৯৭১ একটি ভয়ানক বছর। এই সময় অনেক নিরীহ নিরাপরাধ মানুষের প্রাণ দিতে হয়েছিল। আমি বাবার কাছে মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী শুনেছি। তখন তার বয়স ছিল ১৯ বছর।

আমার বাবা বাস করত ঝিনাইদাহ জেলার শৈলকুপা থানার আবাইপুর গ্রামে। হঠাৎ একদিন রাতে পাকবাহিনী আবাইপুর গ্রাম ঘেরাও করে। কিছু লোককে মারধর করে আর কিছু লোককে গুলি করে হত্যা করে। কারণ তারা কালো পোশাক পরেছিল। তার পরদিন পাকবাহিনী চলে যাওয়ার সময় আলফাপুর মীনগ্রাম নামক স্থানে মুক্তিবাহিনীর সাথে সংঘর্ষ চলে। সেখানে পাকবাহিনীর ১০জন মারা যায়। আর মুক্তিবাহিনীর দুইজন শহীদ হয়। সেইখানে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার ছিল আকবর আলী খান ও নবুয়াত মোল্লা। এদের বাড়ি শ্রীপুর থানার অধীন বীরশ্রেষ্ঠ গ্রামে। পাকবাহিনী একমাস পর আবার আসে গভীর রাতে। কামান্না গ্রামে একটি বাড়িতে মুক্তিবাহিনীর প্রায় ৩০-৪০জন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। রাজাকরদের সাহায্য নিয়ে তারা বাড়িটিকে ঘেরাও করে এবং সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলে। কিন্তু তার ভিতর থেকে একজন বেঁচে যায়। পাকবাহিনী ওখান থেকে আবাইপুরে আসে। আবাইপুর ওয়াবদা অফিসেও মুক্তিবাহিনী ছিল। তাদেরকেও হত্যা করে। তারপর তারা ওয়াবদা অফিসে চারদিন ছিল। গ্রামবাসী ভয়ে অন্য জায়গায় যাওয়ার পথে পাকবাহিনী তাদেরকে ধরে বলে, 'কলমা বাতাও'। যারা বলতে পেরেছিল তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিল। আর যারা বলতে পারেনি তাদেরকে মেরে ফেলেছিল। শেষ এক ব্যক্তি পারবে না বলে হাত জোড় করে বলছিল 'আমি ক্ষমা চাচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দিন।' পাকবাহিনী সেই হাতেই গুলি করে। যার ফলে তার হাতের চারটি আঙুল উড়ে যায়। তার নাম ঋষিকেশ কুন্ডু। সে পালাবার চেষ্টা করলে পিছন থেকে গুলি মারে। গুলি পিঠ দিয়ে ঢুকে বুক দিয়ে বের হয়ে যায়। তার পরও সে দৌড়াতে থাকে, তখন তার হাঁটুতে গুলি করে। সে চারদিন ওই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকে। শিয়াল তার গায়ের রক্ত চেটে খায়। বাগানের ভিতর দিয়ে এক মহিলা আসছিল তখন দেখে ওই ব্যক্তি কাতরস্বরে বলছিল জল জল। তাই দেখে সেই মহিলা আঁচল ভিজিয়ে জল খাওয়ায়। চারদিন পর যখন পাকবাহিনী চলে যায় তখন আস্তে আস্তে গ্রামবাসী তাকে নিয়ে আসে। তারপর ঋষিকেশের বৌকে ডেকে নিয়ে আসে। সাথে কিছু লোকজনও আসে। পরদিন গরুর গাড়িতে করে তাকে ভারতে নিয়ে যায়। ভারতে যেতে তাদের চারদিন সময় লাগে। ভারতের কৃষ্ণনগর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য তাকে ভর্তি করা হয়। তিনি ১২ বছর বেঁচে ছিলেন।

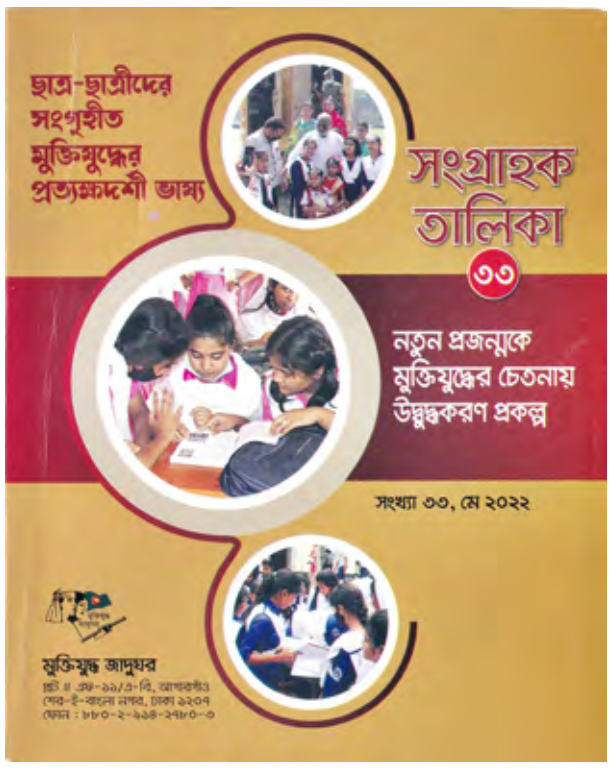

পাকবাহিনী যে চারদিন ছিল তার ভিতর একদিন তুমুল বৃষ্টি হয়। জল হয়ে যায় হাঁটু পর্যন্ত। তখন আমার ঠাকুরদা ঠাকুমার ঔষধ কেনার জন্য বাইরে বেরতে না বেরতেই পাকবাহিনী হাজির। আমার ঠাকুরদাসহ আরও অনেক লোককে নিয়ে যায় ইট পেতে রাস্তা তৈরির করাতে। তাদের সামনে কিছু লোককে মেরে ফেলে। তাদের ভিতর বেশির ভাগই ছিল হিন্দু। কিন্তু আমার ঠাকুমা অসুস্থ থাকায় আমার ঠাকুরদা তাদের কাছে প্রার্থনা করে তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য, তাই তাকে ছেড়ে দেয়।

একটি ছেলে ভারতে গিয়েছিল বয়স্ক মাকে নিয়ে থাকার ব্যবস্থা করতে। ব্যবস্থা করে মাকে নিতে আসে। বাড়িতে তার মা ও স্ত্রী ছিল। সে ফিরে আসার পূর্বে পাকবাহিনী তার স্ত্রীকে তার মায়ের সামনে হত্যা করে। তাই দেখে এই বুড়ি মরার মতো হলে তাকে না মেরে চলে যায় পাকবাহিনী। বুড়ি ভয়ে এক ঘরের কোনে চুপচাপ বসেছিল। সেখানে কোনো খাবার, জল কিছু ছিল না। সে খেতে না পেয়ে মারা যায়। তার ছেলে এসে এরকম দেখে মনের কষ্টে যখন ফিরে যাচ্ছিল ভারতে তখন পাকবাহিনী তাকেও হত্যা করে। সেই ছেলেটির বয়স ছিল প্রায় ২৩ বছর এবং নাম বিনয়।

এই তথ্যগুলোই আমি আমার বাবার কাছ থেকে জানতে পেরেছি। রানাঘাট মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে বাবার মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং চলা অবস্থায় দেশ স্বাধীন হয়।

সূত্র : ২৩১৭০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
শান্তা কুন্ডু	**নিমাই চন্দ্র কুন্ডু**
মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হাসপাতাল পাড়া, মাগুরা
৯ম শ্রেণি, মানবিক (ক), রোল-২২	বয়স : ৬২, সম্পর্ক : বাবা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন

নতুন প্রজন্মের প্রকাশকদের সৃজনশীল ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো নতুন প্রজন্মের প্রকাশকদের নিয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা। ৭ জুন ২০২৩ আয়োজিত এই কর্মশালার প্রতিপাদ্য ছিল 'মুক্তিযুদ্ধে চেতনা বস্তবায়ন : নতুন প্রজন্মের প্রকাশকদের সৃজনশীল ভূমিকা।' এতে অংশগ্রহণ করে ঢাকার ১৭ জন তরুণ প্রকাশক, যারা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ লালন করে এবং প্রকাশনায় তার বাস্তবায়ন ঘটাতে উদ্যোগী।

কর্মশালার শুরুতে 'মুক্তিযুদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর। তিনি বলেন, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি তার কাজকে একটি রিকসার সাথে তুলনা করেন, যার তিনটি চাকা। যার একটি চাকা হচ্ছে পাঠাগার, দ্বিতীয় চাকা প্রকাশক এবং তৃতীয় চাকা পাঠক। মিনার মনসুর তার অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, প্রকাশকরা পাঠকের চাহিদা তৈরি করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। ফলে ১৮ কোটি মানুষের দেশে প্রকাশকরা দুই-তিনশ বই প্রকাশ করছেন কিন্তু তা বিক্রি হচ্ছে না, এর আগে জনসংখ্যা কম ছিল তবু বই প্রকাশিত হয়েছে সর্বনিম্ন ১২৫০ কপি। আমাদের দেশে প্রায় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থী রয়েছে যাদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করা খুব সহজ যা শুধু যথাযথ উদ্যোগের অভাবে বৃদ্ধি করা বা প্রসার করা যাচ্ছে না। তিনি বলেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পাঠাগার এবং প্রকাশকদের সাথে কাজ করে এই দুটি ক্ষেত্রের অনেক সমস্যা সমাধানে সফল হয়েছেন, এখন দরকার পাঠক সৃষ্টি। এই লক্ষে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র গৃহীত উদ্যোগসমূহ তিনি তুলে ধরেন।

এরপর জাদুঘরের গবেষণা ও গ্রন্থাগার বিভাগের ব্যবস্থাপক ড. রেজিনা বেগম গবেষকদের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তথ্য ভান্ডারের ভূমিকা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মানসম্মত বইয়ের চাহিদা এখনও আছে। মানসম্পন্ন বই প্রকাশের জন্য প্রকাশকদের আন্তরিক হতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ ২৫ বছর পর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের দীর্ঘদিন পরে প্রতিষ্ঠিত হলেও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মূল শক্তি বাংলাদেশের জনগণ। জনগণের অংশগ্রহণে প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর হলো স্মারক সংগ্রহশালা যা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষকদের জন্য খুবই প্রয়োজন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তথ্য ব্যবহার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের বর্ণনায় উল্লেখ করেন, আবদুল মতিন, এস এ জালাল, এ এম এ মুহিত, মহিউদ্দিন আহমদ প্রমুখ ব্যক্তির মুক্তিযুদ্ধকালীন পত্রপত্রিকার সংবাদভাষ্যের নিজস্ব সংগ্রহ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এছাড়া রয়েছে প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট আরও দলিলপত্র। প্রয়োজনে সেগুলো গবেষকরা ব্যবহার করতে পারেন।

এরপর 'মুক্তিযুদ্ধের বই : বৈশিষ্ট্য, প্রবণতা, নতুনের আবাহন' বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক। তিনি 'মুক্তিযুদ্ধের বই : অনন্য ও ব্যতিক্রমী প্রকাশনা-ধারা' সম্পর্কে বলেন, ইতিহাস থেকে উত্থিত গ্রন্থরাজি কোনো ফরমায়েশ কিংবা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয়নি। একাত্তরে চিত্তরঞ্জন সাহা যে বইগুলো 'স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ' থেকে প্রকাশ করলেন, প্রকাশনার ইতিহাসে তা অনন্য। সত্তর ও আশির দশকে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যাও বেশি নয়, তবে প্রভাবসঞ্চারী, যে বইগুলো মূলত স্মৃতিচারণমূলক। এখন শিক্ষাক্রমের সঙ্গে মিলে প্রকাশনার সুযোগ তৈরি হয়েছে। সৃজনশীল ও নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী বইয়ের চাহিদা প্রকাশকের ভাবনাকে অনেকাংশে বিকশিত করবে মুক্তিযুদ্ধের বই প্রকাশনায়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সেখানে একটা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

কর্মশালার দ্বিতীয় পর্বে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম 'মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রকাশনায় নতুন ভাবনা ও সম্ভাবনা' বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, মানহীন প্রকাশনার কারণে পাঠক হারিয়ে ফেলছি আমরা। প্রকাশকরা যদি পাঠকের আস্থা অর্জন করতে পারে তাহলে তাদের বই পাঠকরা নির্দ্বিধায় কিনবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রচুর গ্রন্থ বর্তমান থাকলেও এখনও অনেক অচর্চিত বিষয় আছে, যে বিষয়গুলো নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হতে পারে এবং বই প্রকাশ হতে পারে। নবীন প্রকাশকরা মতবিনিময়কালে প্রকাশনা ক্ষেত্রে তাদের নানান সমস্যা তুলে ধরেন।

এস এম মোহসীন হোসেন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুদান দিলেন যারা

প্রতীকী ইট	:	গগণ হীরামন	১০,০০০/-
		তামান্না সারোয়ার	১০,০০০/-
সাধারণ সদস্য	:	ফারুক আহমেদ	২৫,০০০/-
আজীবন সদস্য	:	মু. শামসুল আলম, বীরপ্রতীক	১,০০,০০০/-
		আমালা মধুরিমা আফশীন	১,০০,০০০/-
উদ্যোক্ত সদস্য	:	গীতাঙ্ক দেবদীপ দত্ত	৫,০০,০০০/-
		শ্রাবন্তী দত্ত	৫,০০,০০০/-

প্রতীকী ইট	:	১০ হাজার টাকা
সাধারণ সদস্য	:	২৫ হাজার টাকা
আজীবন সদস্য	:	১ লাখ টাকা
উদ্যোক্তা সদস্য	:	৫ লাখ টাকা
স্থাপনা সদস্য	:	১৫ লাখ টাকা
পৃষ্ঠপোষক সদস্য	:	৫০ লাখ টাকা
সম্মানীয় পৃষ্ঠপোষক সদস্য: ১ কোটি বা তদুর্ধ্ব		

প্রিয় সুহৃদ,

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস ধারণ করে এবং তাদের মধ্যে সেই আদর্শকে প্রবাহিত করে ২৭ বছরের পথ চলা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের। এই দীর্ঘ পথচলায় শুভানুধ্যায়ীদের সমর্থন ও সহযোগিতাধন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আজ আগারগাঁওয়ে নিজস্ব ঠিকানায় সুবৃহৎ পরিসরে আন্তর্জাতিক মানের জাদুঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, এই মুহূর্তে প্রয়োজন ভবিষ্যতে জাদুঘর পরিচালনার জন্য এবং জাদুঘর যাতে শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে পারে তেমন একটি বড় স্থায়ী তহবিল গড়ে তোলা।

আপনাদের আহ্বান জানাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যপদ সম্পর্কে জানুন এবং জাদুঘরের যে কোন একটি সদস্যপদ গ্রহণ করে স্থায়ী তহবিল গড়ে তোলার এবং আগামীর পথচলার অংশীদার হোন। আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের সকলের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থায়ী তহবিল গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

বিশেষ অতিথিদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৭৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৬০০ প্রশিক্ষণার্থী ১৮ মে এবং ১ জুন ২০২৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

১৪ জুন ২০২৩ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন ভারতের বিভিন্ন গান্ধী আশ্রম থেকে আসা ১৭ জন প্রতিনিধি

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official